সালাফী ইসলামের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ইয়াসির ক্বাদী

১। সংজ্ঞা

২। সালাফী ধারার ইতিবাচক অবদান

৩। সালাফী চিন্তার সমালোচনা

৪। উপসংহার

১. সংজ্ঞা: সালাফী ইসলাম কী?

‘সালাফী চিন্তা’ আসলে কী? এ ব্যাপারে কোনো সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা নেই। কাজেই আধুনিক সালাফী ফেনোমেনাকে আমি যেভাবে তুলে ধরতে চাই, তার রূপরেখা এ রকম: সালাফিজমের উৎপত্তি, এর কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন, সাম্প্রতিককালে নানাবিধ গ্রুপের মাধ্যমে এর বিকাশ এবং ইসলাম ও বৈশ্বিক সমাজে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল আলোচনা।

বর্তমান আধুনিক যুগে, আরো নির্দিষ্ট করে বললে, গত অর্ধ-শতাব্দী ধরে ‘সালাফী’ অভিধাটি একটি ইসলামী কর্মপদ্ধতি হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের ঈমান ও আমল অনুসরণের মাধ্যমে নবুওয়তী যুগের যথাসম্ভব কাছাকাছি পৌঁছানো হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য। এই উচ্চাকাঙ্খার কারণ হলো, ইসলামের প্রথম তিনটি যুগের মুসলমানগণ মহানবী (সা) ও নবুওয়তী যুগের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকায় মনে করা হয়, তাঁরা হলেন মহানবীর (সা) সুন্নতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিফলন এবং আদি-অকৃত্রিম ইসলামের বাহক।

যেহেতু এই পরিভাষাটি একটি কর্মপদ্ধতিকে নির্দেশ করে, তাই বলা যায়, এর মাধ্যমে মুসলমানদের কোনো দল, স্বতন্ত্র কোনো কমিউনিটি বা গ্রুপকে বুঝায় না। প্রায় ডজনখানেক গ্রুপ নিজেদেরকে সালাফী হিসেবে দাবি করে থাকে। হয় তাঁরা সালাফী মানহাজের (কর্মপদ্ধতি) উপর রয়েছে বলে বিশ্বাস করেন; নয়তো তাঁদেরকে সালাফী মানহাজভুক্ত হিসেবে অভিহিত করা হলেও তাঁরা তাতে আপত্তি করেন না। এ থেকে এটা আরো বেশি স্পষ্ট হয়, এই পরিভাষাটি নির্দিষ্ট কোনো গ্রুপের জন্য প্রযোজ্য নয়। যাই বলা হোক না কেন এটা লক্ষ্যনীয় - এই প্রত্যেকটি গ্রুপের দাবি হচ্ছে সালাফী পরিভাষাটি কেবল তাদের জন্যই প্রযোজ্য। সালাফী দাবিদার অন্য কেউ ‘সঠিক সালাফিজমের’ উপর নেই বলেও তাঁদের অভিযোগ। তাই সালাফিজম সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভের পূর্বশর্ত হলো সালাফী ইসলামের নানা ধারার মধ্যকার মতৈক্য ও মতানৈক্যগুলো বুঝতে পারা।

১.১ সালাফী আন্দোলনগুলো যেসব ব্যাপারে একমত

ব্যতিক্রম বাদ দিলে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল সালাফী ধারার মধ্যে বিদ্যমান। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১) তাঁদের বিবেচনায়, কেবল তারাই সালফে সালেহীন তথা ন্যায়নিষ্ঠ পূর্বসূরীদের শিক্ষা ও বিশ্বাস সঠিকভাবে পালন করছেন।

বিশেষ করে, সালফে সালেহীনগণ যে ধর্মীয় আকীদার কথা বলে গেছেন, তাঁরা সেটাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। সাধারণত এটা ‘আসারী’ আকীদা হিসেবে পরিচিত।

২) আল্লাহর নাম ও গুণাবলি (তাওহীদে আসমাউস সিফাত) সংক্রান্ত যে কোনো রূপক বা প্রতীকী ব্যাখ্যাকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। এ ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া মু'তাজিলা ও আশ'আরী গ্রুপগুলোর বৈশিষ্ট্য।

৩) ইবাদত বা দাসত্ব পাওয়ার অধিকার (তাওহীদে উলুহিয়্যাহ) একমাত্র মহান আল্লাহর বলে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যা কিছুই এই আকীদার সঙ্গে আপস করে, তাঁরা তাকে ভ্রান্ত মনে করেন। একারণে তাঁরা কোনো কোনো সুফীর অন্য ধর্মীয় মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। যেমন - ওলীদের প্রতি চরম ভক্তি, মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে মধ্যস্থতা ইত্যাদি।

৪) ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবধরনের ঘৃণ্য উদ্ভাবন (বিদ'আহ) এর বিরোধিতা করেন এবং এসবের সঙ্গে যাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে (আহলুল-বিদ’আ) তাদের থেকে নিজেদের আলাদা রাখেন। বিশেষতঃ শী’আ মতবাদের ব্যাপারে তাদের ঘোর বিরোধিতা রয়েছে। এর বিশেষ কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ সাহাবিদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার শী’আ মতবাদ।

৫) ফিক্হী ও আকিদাগত মতামতের ক্ষেত্রে তাঁরা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাকে (রাহিমাহুল্লাহ) (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি/১৩২৮ ঈসায়ী) বিশেষভাবে সম্মান করেন। এবং এসব ব্যাপারে তাঁর মতামতকে প্রাধান্য দেন। তবে এটা মনে রাখা গুরুপূর্ণ যে ইবনে তাইমিয়্যাকে আধুনিক সালাফী আন্দোলনের জনক হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব নয় এবং সালাফীরা তাঁকে এর জনক হিসেবে গণ্য করেন না। কারণ, নবী মুহাম্মদ (সা) এর পর আর কাউকেই তাঁরা তাঁদের একক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করেন না।

১.২ সালাফী গ্রুপগুলোর মধ্যকার বিতর্কের বিষয়সমূহ

উপরোক্ত ব্যাপারগুলোতে সালাফী গ্রুপগুলোর মধ্যে ঐকমত্য থাকলেও, অসংখ্য ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিটি বিবাদমূলক বিষয়ে পাওয়া যায় নানাধরনের মত। যেসব বিষয়গুলো নিয়ে সালাফী গ্রুপগুলোর মধ্যে বিতর্ক রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১) মাযহাব বা ইসলামি আইনি মতধারা অনুসরণের বৈধতা ও কোন এক মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অবস্থান:

কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণ করার ব্যাপারে বহুসংখ্যক সালাফী দলগুলোর মধ্যে পরস্পর সাংঘর্ষিক অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে অবস্থান এতটাই জটিল যে, এটা তাদের মধ্যে উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাযহাব নিয়ে তাদের মধ্যে মোটাদাগে তিন ধরনের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়:

ক) অননুমোদিত: মাযহাবের পদ্ধতিগত ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা ঐতিহাসিকভাবে ইবনে হাজমের (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরি) অনুসারী যাহিরীপন্থীদের বৈশিষ্ট্য। মাযহাব-বিরোধিতার আধুনিক পুনর্জাগরণের আদি-উৎস খুঁজে পাওয়া যায় মুহাম্মাদ হায়াত আস-সিন্ধীর (মৃত্যু ১১৬৩ হিজরি) মধ্যে। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন আস-সান’আনী (মৃত্যু ১১৮২ হিজরি), আশ শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হিজরি), সিদ্দীক হাসান খান (মৃত্যু ১৩০৭ হিজরি)[১] এবং অতিসম্প্রতি নাসির আদ-দীন আল-আলবানি (মৃত্যু ২০০০ ঈসায়ী)। উপরোক্ত সবাই সন্দেহাতীতভাবে মাযহাব-বিরোধী।

খ) বৈধ কিন্তু নিরুৎসাহিত: জরুরি অবস্থায় কোনো কোনো সালাফী গ্রুপ সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব অনুসরণের অনুমতি দেয়। তবে দলিল বা শক্তিশালী প্রমাণ পেশ করা হলে সেক্ষেত্রে তাকে সেটা অনুসরণের কথা বলা হয়।[২]

গ) অনুমোদিত: সাধারণভাবে সুন্নী ইসলামে সাধারণ মুসলিমদের জন্য মাযহাব অনুসরণকে উৎসাহিত বা বাধ্যতামূলক বলা হয়। সালাফী মতধারার বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেও এটা খুঁজে পাওয়া যায়। ‘নাজদি দা’ ওয়াহ্’র প্রবক্তা মুহাম্মাদ বিন ‘আবদুল-ওয়াহহাব (মৃত্যু ১২০৬ হিজরি)[৩] আকিদার দিক দিয়ে আস-সিন্ধী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন হানবালী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী। ইসলামি রীতি ও বিধির ক্ষেত্রে মাযহাবের মধ্যে থাকাকে তিনি বৈধ ও প্রশংসিত হিসেবে বিবেচনা করতেন।

২. আহলুল-বিদ’ আহর সংশ্লিষ্টতা ত্যাগ করা

তাত্ত্বিকভাবে সব সালাফী গোষ্ঠী বিদ' আত ও যারা এর অনুসরণ ও প্রচার করেন তাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখেন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কীভাবে হবে এবং এর সীমা কতটুকু সে ব্যাপারে গোষ্ঠীভেদে এবং ' আলিমভেদে বিভিন্নতা আছে।

এই ইস্যুতে যারা সবচেয়ে বেশি কঠোর তাদের দৃষ্টিতে অনেকেই বিদ' আতি হিসেবে পরিগণিত হন। আর এটা হয় ' সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে দোষী'—এভাবে একের সঙ্গে অন্যকে জুড়ে দিয়ে। ধরুন, ' ক' বিদ' আতি। এখন ' ক' -এর সঙ্গে যদি ' খ' -এর সংশ্লিষ্টতা থাকে তাহলে ' খ' -ও বিপথগামী হিসেবে পরিগণিত হবেন। ' গ' যদি ' খ' -এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রাখেন তাহলে সেও বিপথগামী। এভাবে সীমাহীনভাবে, ন্যাক্কারজনকভাবে চলতে থাকবে। এভাবে একের পর একজনকে বিদ' আতি পরিগণিত করার দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু সম্ভাব্য পরিণতি হচ্ছে একই সালাফী কমিউনিটির মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপের সৃষ্টি হওয়া।

এই কর্মপদ্ধতিটি ' মাদখালী' গ্রুপের বৈশিষ্ট্য। সাউদি শাইখ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালীর শিক্ষার্থীদের ' মাদখালী' নামে অভিহিত করা হয়। এমন কর্মপদ্ধতিকে তাঁরা আল জারহ ওয়াল-তা' দীল-এর বর্ধিত রূপ হিসেবে বিবেচনা করেন। (আল জারহ ওয়াল-তা' দীল হচ্ছে ' হাদীস পর্যালোচনা' র সেই বিশেষ শাখা যেখানে হাদীস বিশেষজ্ঞরা হাদীস বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করেন)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাদখালী ধারার জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তবে এরপরও অনেক অ-মাদখালী সালাফীরা এই ইস্যুতে কট্টর মনোভাব ধারণ করা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের কনফারেনস ও সমাবেশে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাতেও কুণ্ঠিত বোধ করেন।

তবে কিছু সালাফী 'আলেম ও গ্রুপ এই ইস্যুতে কিছুটা শিথিল মনোভাব পোষণ করেন এবং অ-সালাফী কমিউনিটির সঙ্গে তাদের মনোভাব সহযোগিতামূলক। (যেমন: দেওবন্দীদের সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করেন তবে শী' আদের সঙ্গে নয়)।

৩) ' ঈমান' -এর ব্যাপারে আকিদাগত অবস্থান এবং আমল ঈমানের অপরিহার্য অংশ নাকি সম্পূরক

ঈমান এবং এর অর্থ সম্পর্কিত আলোচনা অনেকটা সাম্প্রতিক। শাইখ আল-আলবানী যখন বলেছেন যে, আমলকে তিনি ঈমানের অপরিহার্য অংশ মনে করেন না, তখন ৯০ দশকের শেষের দিকে এ সংক্রান্ত আলোচনা নতুন মাত্রা পায়।[৪] এর পূর্বে সালাফীদের প্রমিত (standard) অবস্থান ছিল কিছু কিছু আমল বা কাজ ঈমানের অপরিহার্য অংশ। এবং এগুলোর অনুপস্থিতিতে ঈমান হুমকির মুখে। এটা ইবনে তাইমিয়্যার সুস্পষ্ট অবস্থান এবং আসারী আকিদার অনুসারী ' আলিমদের অবস্থানও তা-ই।

৪) ইসলামি শাসকের প্রতি আনুগত্য (তা' আত ওয়ালী আল-আম্‌র) এবং যে-পরিমাণ রাজনৈতিক সক্রিয়তা অনুমোদিত।

এই পয়েন্টটি অনেক ব্যাপক ও জটিল। সম্ভবত যারা এই আন্দোলনের বাইরে তাদের মতবিরোধের সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয় এটা। রাজনৈতিক সক্রিয়তার স্তর ও রাজনৈতিক ভিন্নমত, মুসলিম শাসক কিংবা অবৈধ শাসকের ' ইসলাম' -এর প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারগুলো আকিদার দিক থেকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। বর্তমান সময়ের নিয়ত-পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক সালাফী ' আলিম এ বিষয়টা নিয়ে মোকাবিলা করেছেন। তাঁদের অবস্থানগুলোকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়:

ক) বৈধ শাসকের কর্তৃত্বকে সমালোচনা করা আকিদাগতভাবে নিষিদ্ধ। এটা অপরাধ এবং বিপথগামী হওয়ার সমান। কিছু সালাফী গ্রুপ, নির্দিষ্ট করে বললে, "মূলধারার" সাউদি সালাফী ও মাদখালীরা মারাত্মকভাবে সরকার-অনুগামী।[৫]

খ) শাসকদেরকে প্রশ্ন করা এবং পরামর্শ দেওয়া আল-আম্‌র বিল-মা' রূফ ওয়ান-নাহ্‌য়ি ' আনিল-মুনকার (ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ)-এর বর্ধিত রূপ। সরকারী নীতিনির্ধারণকের বিরুদ্ধে কথা বলাকে কিছু সালাফী গ্রুপ বৈধ মনে করেন। তাঁরা এটাকে গণ্য করেন ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধের প্রয়োজনীয় বর্ধিত রূপ হিসেবে। তাঁদের মতে এটা অত্যাচারীর অত্যাচার নিবৃত্ত করার ইসলামি মূলনীতির সমান। সাউদি আরাবিয়ার সাহওয়া ' আলিমগণ এই মত ধারণ করেন। তাঁদের ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গ) মুসলিম ভূমির সব শাসকের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। কিছু সালাফী গ্রুপ আছে যারা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের সব শাসকের শাসনকে (বা কেবল যারা শারী' আহ দ্বারা শাসন করেন না তাদের সবাইকে) অবৈধ মনে করেন। তাদেরকে অবিশ্বাসী বা কাফির বিবেচনা করেন। তাদের মতে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে এসব শাসকদের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।[৬]

৫. তাকফীর (একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে বাতিল মনে করা) ইস্যু এবং নির্দিষ্ট করে যারা শারী' আহ দ্বারা শাসন করে না সেসব

শাসকদেরকে তাকফীর করা (আল-হুক্‌ম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহু)[৭]

এ ব্যাপারেও আছে নানামুখী অভিমত[৮]:

ক) যেসব মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসকেরা সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ আইন দিয়ে শাসন করে তারা মুসলিম। সাউদি আরাবিয়ার সাবেক প্রধান মুফতি, শাইখ ' আবদুল-' আযীয বিন বায (মৃত্যু ১৯৯৯ সাল) এবং শাইখ আল-আলবানীর মতে (নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে; এগুলো যাচাই করা যদিও কঠিন), যে-শাসক সেক্যুলার আইন দিয়ে বিচার করেন তিনি মুসলিম। তারা একে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু এটা সে মাপের অপরাধ নয় যা কিনা একজন মানুষকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যাবে।

খ) তারা মুসলিম। এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাদের আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন দ্বারা শাসন করা বড় কুফ্‌র। মধ্যপন্থী অনেক সালাফী ' আলিম, যেমন শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-' উসাইমীনের (মৃত্যু ২০০১ সাল) এই মত পোষণ করতেন।

গ) যারা সেক্যুলার আইন দিয়ে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল শাসন করেন তারা কুফরি করেছেন। তাদের শাসন অবৈধ। তারা মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবেন না। কাজেই তাদের প্রতি আনুগত্যও বাতিল। আবূ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী ও আবূ মুস' আব আল-সূরীর মতো কট্টরপন্থীদের অভিমত এটা। তাদের লেখালেখিগুলো জিহাদি-সালাফী আন্দোলনসমূহকে উৎসাহিত করে। এই বিষয়টি নিয়েই আমরা পরবর্তী পয়েন্টে আগাব।

৬) জিহাদ প্রসঙ্গে অবস্থান

সালাফী অধিকাংশ গ্রুপ যদিও শান্তিকামী, তবে গোটা ' সালাফী আন্দোলন' -এর মধ্যে সংখ্যালঘু কিছু গ্রুপ "সশস্ত্রপন্থী" অবস্থান গ্রহণ করেন। উম্মাহর কিছু অংশের উপর অথবা উম্মাহর সকল সামর্থ্যবান সদস্যদের উপর জিহাদকে তাঁরা বাধ্যতামূলক হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁরা নিচের একটি বা উভয় নীতিই অনুসরণ করেন:

ক) মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে সেক্যুলার শাসকদের উৎখাত।

খ) যেসব অমুসলিম সরকার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করেছে তাদের সঙ্গে লাগাতার সংঘর্ষ বাজিয়ে রাখা।

শেষোক্ত তিনটি পয়েন্ট (অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া আইন বাদে অন্য আইনের শাসন, শারী' আহ ছাড়া অন্য আইন দিয়ে যে-মুসলিম শাসন করেন তার ঈমানের বিরোধিতা এবং জিহাদের বিষয়টি) একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আল্লাহর দেওয়া আইন ছাড়া অন্য আইন দিয়ে যারা শাসন করেন সেসব শাসকের ঈমান ও তাদের শাসনের বৈধতা নিয়ে যারা সবচেয়ে কট্টর অবস্থান ধারণ করেন, তাকফীর ঘোষণায় অনিবার্যভাবে তারাই সবচেয়ে প্রান্তিক অবস্থান নেন। আর এতে করে তারা সামরিক জিহাদের প্রয়োজনীয়তার ভিত তৈরি করেন।

১.৩ কিছু প্রসিদ্ধ সালাফি গ্রুপ[৯]

১) মূলধারার সাউদি সালাফীঃ সালাফী গ্রুপগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় গ্রুপ এবং সর্বাধিক পরিচিত। বেশিরভাগ সাউদি ' আলিম এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা সাধারণত একটি মাযহাব (প্রায় ক্ষেত্রেই সেটা হানবালী মাযহাব) অনুসরণ করেন। তাঁরা শান্তিকামী এবং তাঁদের শাসকের প্রতি অনুগত। সাউদি 'আলেম ঘরানার প্রতিনিধিত্বশীল এই গ্রুপটি ঢালাওভাবে তাকফীর করা এড়িয়ে চলেন। চরমপন্থী জিহাদী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধেও তাঁরা সোচ্চার।

২) শাইখ আল-আলবানীর জর্ডানীয় সালাফীঃ সমর্থকসংখ্যার দিক দিয়ে এরাও বেশ প্রসিদ্ধ। তাঁরা প্রচণ্ড রকমের মাযহাব-বিরোধী। দলিল-ভিত্তিক ইসলামি ফিকহি ব্যবস্থার কট্টর সমর্থক। রাজনৈতিকভাবে তাঁরা সবচেয়ে নীরব ভূমিকা পালন করেন। জিহাদি সালাফী কিংবা শাসকদের বিষয়ে কথা বলার ব্যাপার তাঁরা সক্রিয়ভাবে এড়িয়ে চলেন। যদিও জিহাদিদের ব্যাপারে তাঁদের এমন অবস্থান প্রথম ধারাটির মতন জোরালো নয়। ফিক্‌হের ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বেশি আক্ষরিকতাবাদী (literalist) এবং বিদ'আর ধারণা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এরা কঠোর। একারণে অনেক বিদ' আতকে অন্যান্য সালাফী গ্রুপগুলো যেখানে ক্ষতিকর হিসেবে দেখবেন না, সেসব ক্ষেত্রেও তাঁরা কঠোর মনোভাব ধারণ করেন। (উদাহরণস্বরূপ: মাসজিদের ভেতরে আযান দেওয়া, কার্পেটে কাতার সোজা করার জন্য দাগ দেওয়া কিংবা মিনবারে তিনের বেশি সিঁড়ির ধাপ থাকা ইত্যাদি।)

৩) সাউদি আরবের সাহওয়া আন্দোলনঃ শাসকদের উৎখাত না করে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সাউদি আরবের সাহওয়া গ্রুপ। এই ধারার অন্যতম ‘আলিমরা হলেন শাইখ সাফার আল-হাওয়ালী এবং শাইখ সালমান আল-আওদাহ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা বেশ বিচারবুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতেও তাঁরা বেশ সক্রিয়। এর ফলে শিক্ষিত তরুণ সমাজের মধ্যে তাঁরা আবেদন তৈরি করতে পেরেছেন। তাঁদের সমাজে বিদ্যমান নানা সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ মুসলিমদের প্রতি তাঁদের উদ্বেগের প্রমাণ দেয়।

৪) সাউদি সালাফী গ্রুপের ছোট উপদল হচ্ছে মাদখালীঃ তাঁরা একটু আলাদা এবং সাধারণ সালাফী গ্রুপগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম। তাঁদের কর্মপন্থা মৌলিকভাবে বিভাজনমূলক। এই ধারার অনুসারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্যদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন: অন্যান্যরা সঠিক সালাফী পথের উপর আছেন কি নেই এই নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা। কে তাঁদের মানহাজের উপরে আছে আর কে নেই, এই নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যেই ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে। কালক্রমে তাঁরা হ্রাস পাচ্ছে। অন্যান্যদের ব্যাপারে তাঁদের উন্মত্ত খণ্ডন এবং সেগুলোর যৎসামান্য প্রভাবেই এর প্রমাণ মেলে।[১০]

৫) মিশরীয় সালাফী: অন্যান্য সালাফী গ্রুপের মতো এদের মধ্যেও বিভিন্নরকম মত দেখা যায়। আরব বসন্তের পর থেকে এরা কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মিশরীয় সালাফীরা মূলত জর্ডানীয়-আলবানী শাখা দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। আর তাই ফিক্‌হি বিষয়ে তারা বেশ আক্ষরিক নীতি অনুসরণ করেন। মিশরীয় সালাফীদের মধ্যেও মাদখালীদের অনুরূপ গ্রুপের দেখা মেলে। সব দেশের মতো এখানেও দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের রয়েছে স্বতন্ত্র অবস্থান। মিশরীয় সালাফীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা আন-নূর পার্টি গোঁড়াভাবে সিসি সমর্থক। অন্যান্যরা রাজনীতিতে অতটা আগ্রহী নয়। অনেকে আবার বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সমালোচনামুখর। মিশরীয় সালাফিজ্‌ম বর্তমানে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন গ্রুপগুলো কে কোন অবস্থান নেয়, এবং এর থেকে কী সূক্ষ্ম পরিবর্তন আসে সেটা মূল্যায়ন করার সময় এখনো হয়নি।[১১]

৬) তাকফীরি সালাফী: এরা সাধারণত তাকফীর ইস্যুতে বেশি জোর দেন। বিশেষ করে যারা শারী‘আহ অনুযায়ী শাসন করে না, তাদের বিরুদ্ধে তাকফীর করেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেন না। কারণ তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে এখনো উপযুক্ত সময় আসেনি এবং যথাযথ শর্ত তৈরী হয়নি। বৈশিষ্ট্যগতভাবে মুসলিম জাতি ও তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রহসনমূলক পশ্চিমা পররাষ্ট্রনীতিকে তাঁরা সামনে নিয়ে আসেন। মুসলিম শাসকদের ভণ্ডামীপূর্ণ আচরণকেও তুলে ধরেন। ওয়ালা’ ওয়াল-বারা’ (আনুগত্য ও অবাধ্যতা)-এর ধারণাটি নিয়ে তাঁরা বেশ আচ্ছন্ন। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে যুদ্ধরত যেকোনো মুসলিম গ্রুপকে সমর্থন দেওয়ার মধ্যে-চাই তাদের কৌশল বৈধ বা অবৈধ, যা-ই হোক। নিয়মিত ও অসতর্কভাবে তাকফীর করার বিষয়টিকে যারা সমালোচনা করেন তাদেরকে তাঁরা ভণ্ডামি (নিফাক) ও অবিশ্বাস (কুফ্‌র)-এর তকমা দেন। বৈশিষ্ট্য আর রূঢ়তার দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে মাদখালীদের বেশ মিল রয়েছে। যদিও মুসলিম শাসকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে তাদের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। সমসাময়িক যারা এই গ্রুপের সঙ্গে জড়িত তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী ও আবূ মুস‘আব আস-সূরী। পশ্চিমে এদের অনুসারী সংখ্যা ছোট হলেও বেশ নিবেদিত (এরা মূলত আমেরিকান শাইখ আনওয়ার আল-আওলাকি দ্বারা প্রভাবিত কিছু যুবক।[১২] ২০১২ সালে আমেরিকান ড্রোনের এক গুপ্তহামলায় আল-আওলাকিকে হত্যা করা হয়)। এই গ্রুপের অধিকাংশ সদস্যরা যদিও সরাসরিভাবে নিজেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু তাদের লেখনীগুলো পরবর্তী গ্রুপটির ভিত গড়ে দেয়।

৭) চরমপন্থী জিহাদি সালাফী: এদের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক অবস্থান চরমপন্থী। এদের মধ্যে রয়েছে আল-কায়দা ও আইএসআইএস-এর মতো সামরিক সংগঠন। আমি যদিও শেষোক্ত দুই গ্রুপকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করেছি, তবে অনেকেই হয়তো সঠিকভাবে বলবেন যে, এরা মূলত একই সূত্রে গাঁথা। এদের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজনমূলক কোনো রেখা নেই। এখানে এটা উল্লেখ করা জরুরি যে, তাঁদের তাত্ত্বিক অবস্থানে সালাফী পদ্ধতির বহিপ্রকাশ থাকলেও, তাঁদের সামরিক অবস্থানের কারণে অন্যান্য সব সালাফী গোষ্ঠী তাঁদের নিন্দা করেন। অন্যান্য সালাফী গ্রুপগুলো যে ইস্যুতে বাড়াবাড়ি করে না, এরা সে ইস্যুতেই সবচেয়ে বেশি জোর দেন–যেমন তারা জিহাদের যে সংস্করণকে লালন করেন। আর মূলধারার সালাফীরা যেসব ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন সেগুলোকে তারা এড়িয়ে চলেন। (এখানে জেনে রাখা ভালো যে, এই গ্রুপের উৎপত্তি হয়েছে আশির দশকের শুরুতে মুসলিম ব্রাদারহুড থেকে বিচ্ছিন্ন একটা উপগ্রুপ এবং সাউদি সালাফিজ্‌মের সম্মিলনে। তাই বলতে গেলে তাঁদের উৎপত্তি কোন ‘বিশুদ্ধ’ সালাফী উৎস থেকে নয়।)

ভাসা-ভাসা ও অসম্পূর্ণ এই তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ওপরের কোনো একক গ্রুপকে সালাফী হিসেবে আখ্যায়িত করা একটা সমস্যার ব্যাপার। বিদ্যমান বিভিন্ন সালাফী গ্রুপগুলোর মধ্যে অসংখ্য মতভেদ থাকার কারণে এই বাস্তব সমস্যাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, উপরোক্ত কোনো দলই সম্পূর্ণভাবে সালাফী চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করে না।

২. সালাফী চিন্তার ইতিবাচক দিক

আদি-অকৃত্রিম ইসলাম পালনের উৎসাহ যুগিয়ে সালাফি চিন্তা যে পদ্ধতি উপস্থাপন করে তা এক ইতিবাচক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। নব্বই এর দশকের দিকে একটা সময় ছিল যখন ইংরেজি বলয়ের শাইখরা বহু পশ্চিমা তরুণকে সালাফী পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন।

সালাফী আন্দোলনের কিছু ইতিবাচক দিক হচ্ছে:

১) কুর'আন-সুন্নাহকে প্রাধান্য: সালাফী পদ্ধতি মুসলমিদেরকে রুহানি বারাকাহ্‌র পাশাপাশি হিদায়াত এবং বোঝাপড়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শরণাপন্ন হবার দিকে ধাবিত করে। তাঁদের এই চিন্তাধারা অন্যান্য কিছু ট্র্যাডিশনালিস্ট মাযহাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের কুর' আন-সুন্নাহ্ থেকে কোনো অর্থ বা বিধি আহরণে নিরুৎসাহিত করেন এই ভয়ে যে, তারা হয়তো ভুল বুঝবে। অনেক গ্রুপ তো এক্ষেত্রে এতটাই প্রান্তিক অবস্থান নেয় যে, তাঁরা দাবি করেন যে, হাদীসের বইগুলো শুধু বিশেষজ্ঞদেরই পড়া উচিত। তাঁরা সম্ভবত এমনকি কুর' আনের একাডেমিক ও সক্রিয় পাঠকেও নিরুৎসাহিত করেন।

২) সালাফী পদ্ধতি আল-কুর' আন ও সুন্নাহর আলোকে আধুনিক প্রথা ও সংস্কৃতিকে পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখতে উৎসাহিত করে। অমুক বা তমুক শাইখ কী বললেন, বা বাবা-দাদারা কী পালন করে এসেছেন তার পরিবর্তে শক্ত প্রমাণের উপর জোর দেওয়া হয়। সালাফী চিন্তা ' সাংস্কৃতিক ইসলাম' -এর গণ্ডি পেরিয়ে এমন একটি পথ সুগম করে যার ফলে ইসলাম সময় ও স্থানকে ছাপিয়ে অবিকৃত সার্বজনীনতার দিকে ধাবিত হয়। এবং এটি নবুয়াতী সময়ে যা প্রচলিত ছিল তার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৩) ইসলামের লোকজ সংস্করণে দেখা মেলে এমন অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-প্রথাকে এড়িয়ে চলে সালাফী চিন্তা। যেমন: পীর-দরবেশেকে ভিত্তিহীন ভক্তি অথবা কোনো প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে প্রার্থনা করা। এই ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সালাফী চিন্তার লক্ষ্য হচ্ছে অকৃত্রিমভাবে ইসলামের রীতিনীতিগুলো চর্চা করা-ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত।[১৩]

৪) হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই। সালাফী চিন্তার যে প্রভাব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না সেটা হচ্ছে তাঁদের কারণেই অধিকাংশ ইসলামিক আন্দোলনগুলোতে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। এমনকি সালাফী চিন্তার যারা বিরোধিতা করেন, তাঁরাও এখন তাঁদের বইগুলোতে হাদীস উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় বেশ সূক্ষ্ম ও নির্ভুল পদ্ধতির আশ্রয় নেন এবং ক্ল্যাসিকাল ও মধ্যযুগীয় স্কলারদের মতামতের সাথে হাদীসগুলোকে যাচাই করেন। এটা নিঃসন্দেহে সালাফী চিন্তার একটি ইতিবাচক অবদান। আর এজন্য শাইখ আল-আলবানী ও তাঁর লেখনীগুলো অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার।

৫) অ্যাকাডেমিক ইসলামের শাখাগুলো সম্পর্কে সাধারণ ও সর্বব্যাপী জ্ঞান। গড়পড়তা যেকোনো সালাফী সাধারণত ইসলামে উসূলুল-ফিক্‌হের ভূমিকা, মুসতালাহুল-হাদীসের গুরুত্ব, ' উলূমুল-কুর' আনের গঠন ও ব্যাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। কাজেই এটুকু বলা নিরাপদ যে, সালাফী চিন্তার অনুসারী একজন গড়পড়তা সালাফী ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়গুলো সম্পর্কে যতটা জ্ঞান রাখেন অন্য কোন ট্র্যাডিশনের গড়পড়তা একজন অনুসারী অতটা রাখেন না।

৬) সালাফীদের অসাধারণ এক বিশুদ্ধ আকিদা রয়েছে। যেকোনো বস্তুনিষ্ঠ গবেষক এটা খুঁজে পাবেন যে, সুন্নী বিশ্বাসগুলোর মধ্যে আসারী আকিদা সবচেয়ে আগে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আশা' ইরাহ ও মাতুরীদিয়াহ্‌র মতো কালামভিত্তিক আকিদাসমূহেরও অনেক আগের লেখা।[১৪] দ্বিতীয় হিজরি শতকের শেষের দিকে এবং তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকে লিখিত অসংখ্য আকিদার কিতাব থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যার কিছু কিছু ' আকীদাহ আত-তাহাউইয়্যাহ্‌রও আগে লেখা। চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরি শতকে আসারী আকিদাই ছিল সুন্নী ইসলামে প্রভাব বিস্তারকারী আকিদা।[১৫] রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে ষষ্ঠ শতকে এসে যদিও এটা হানবালী মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু ইব্‌ন তায়মিয়্যার অসামান্য লেখনী থেকে এটা নতুন প্রাণ লাভ করে। আরও আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে।[১৬]

৭) ইসলামিক জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং ইসলামি গ্রন্থাগারের পুনরুজ্জীবন। ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখার উপর হাজার হাজার পাণ্ডুলিপির সম্পাদিত কপি ব্যাপকভাবে প্রিন্টিঙের মাধ্যমে সালাফী চিন্তা গবেষণার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। এমনকি তাদের নিন্দুকেরাও সালাফী প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত বইয়ের দারস্থ হন। তাদের অনলাইন ইসলামিক সার্চ ইঞ্জিন, ইলেকট্রনিক ভান্ডার ও ফোরামের দ্বারা অ্যাকাডেমিকরাও বিভিন্ন উপকার পাচ্ছেন। পৃথিবীতে বর্তমানে যেকোনো ইসলামি লাইব্রেরিতে সালাফী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত বই ভালো পরিমাণেই পাওয়া যাবে। কেননা সালাফীরা নিজেদেরকে

ক্ল্যাসিকাল ইসলামি ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে।

৮) ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ শির্ক ও বিদ'আহ এড়িয়ে চলা। যা-ই ত্রুটি থাকুক না কেন, সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ ধরনের শির্ক থেকে সালাফী আন্দোলন নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছে। বিদ'আতের প্রতি অতি-সতর্কতার ফলে ইসলামি ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে এটা ঈর্ষণীয় পবিত্রতা ধরে রাখতে পেরেছে। অতি সতর্কতার দোষে দুষ্ট হলেও (যা আসলেই সমস্যাজনক) অন্যান্য আন্দোলনগুলো যেখানে বিভিন্ন বিপদগামীতার স্বীকার, অতি-সতর্কতার ফলে সালাফী আন্দোলন মারাত্মক পর্যায়ের বিপদগামীতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

সালাফী চিন্তা এমন বেগবান একটি আন্দোলন যেটি প্রতিটা মুসলিমকে সরাসরি আল-কুর'আন ও সুন্নাহর দিকে ধাবিত করে তাদের সবাইকে সক্ষম করতে চায়। এটি এর অনুসারীদের জ্ঞান দিয়ে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করতে, অন্ধঅনুসরণকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং ধর্মীয় গুরুদের দুর্নীতিকে সংশোধন করতে সক্ষম করে তোলে। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে চিন্তা-পদ্ধতি হিসেবে সালাফী চিন্তা যৌক্তিক ও কৌতূহলী মনে আবেদন সৃষ্টি করে। এবং এটি নিঃসন্দেহে মানুষের ফিতরাহ্‌র সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

৩. সালাফী আন্দোলনের সমালোচনা

অন্যান্য যেকোনো আন্দোলনের মতোই, সালাফী আন্দোলন এবং এর অনুসারীরা ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। প্লেটোনিক ইউনিভার্সালের মত সালাফী চিন্তার বিমূর্ত ধারণা মানুষের বাস্তব পৃথিবীর বাইরে কিছু নয়। যেহেতু সকল মানুষই ভুলপ্রবণ, সেহেতু সালফে সালেহিনদের অনুসরণের দাবিতে সালাফিজ্‌মের মধ্যেও কিছু ভুল ও অসংগতি চোখে পড়ে।

সালাফ বা পূর্বসূরিদের অনেক মৌলিক ইস্যুগুলো সমসাময়িক বিভিন্ন সালাফী দলগুলো এড়িয়ে যায়। অনেক সময় বিপরীত অবস্থানও ধারণ করে। সালাফরা মুখোমুখি হননি এমন আধুনিক বিষয়ে সালাফদের অবস্থান কী হতো সেটা নির্ণয়ের চেষ্টায় একটা পদ্ধতিগত ভুল আছে। জাতিরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের ধারণা, গণতন্ত্র, বর্তমান সমাজে নারীদের ভূমিকা, ভোট দেওয়ার অনুমতি, আধুনিক বিশ্বে জিহাদের বিষয়গুলোর মতো বিভিন্ন বিষয়ে যেগুলো ‘সালাফী অবস্থান’ বলে দাবি করা হয়, সেগুলো নিতান্তই ‘আলিমদের ব্যক্তিগত অভিমত (ফাতাওয়া)। এগুলো ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবি করা সম্ভব নয়।

আমার তালিকা শুরু করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসক্লেইমার দিচ্ছি। যে পয়েন্টগুলো আমি তালিকাভুক্তি করছি, এগুলোর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে, এমনকি কিছু সালাফি ধারায় প্রচুর ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া যাবে। **আমি যখন এই তালিকাগুলো করছি, আমি তখন সামগ্রিক পর্যায়ে বলছি। আমি জানি যে, এমন ব্যাপক সাধারণীকরণের মধ্যে মজ্জাগত সমস্যা রয়েছে। সালাফিজ্‌মের ইতিবাচক যেসব দিক আমি উল্লেখ করেছি, সেগুলো কমবেশি সব সালাফী ধারায় পাওয়া গেলেও, নেতিবাচক যেসব দিক আমি উল্লেখ করব, সেগুলো সার্বজনীন নয়। কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিতও করা হয় না।**

তা সত্ত্বেও আমি যা বলব তাতে আমি দৃঢ়: এখানে যেসব সমালোচনা করা হবে তা সামগ্রিকভাবে সালাফী আন্দোলনে ধরা পড়ে। আর এখানে ব্যতিক্রমও আছে। সালাফী আন্দোলন সামগ্রিকভাবে যা শেখায় বা গ্রহণ করে, সেখান থেকে মুক্ত হয়ে অনেকেই এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছেন।

এই সমালোচনাগুলো কেন করছি সেটাও এখানে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এটা এজন্যই করছি, যাতে সালাফীরা এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এবং এগুলোর মাত্রা কমিয়ে আনেন। আমি প্রার্থনা করি যে, একসময় এই সাধারণীকৃত সমালোচনাগুলোই ব্যতিক্রম হয়ে উঠবে। তবে, এই কথাগুলো যখন লিখছি, অধিকাংশ সালাফী ধারায় এই নেতিবাচক দিকগুলো ব্যাপক প্রচলিত এবং লক্ষণাত্মক বৈশিষ্ট্য।

সালাফী আন্দোলনগুলো সবচেয়ে বেশি যেসব ‘সমস্যায়’ জর্জরিত সেগুলো হচ্ছে:

১. আকিদাকে মূলত বিমূর্ত ও তত্ত্বীয় মতবাদের পর্যায়ে নামিয়ে আনাটা ইসলামের বার্তার সঙ্গে সামান্যই সম্পর্ক বহন করে। এতটাই যে, বিমূর্ত ধর্মতত্ত্ব এবং মানুষ-নির্মিত মতবাদ ইসলামের প্রতিটি দিককেই গ্রাস করে।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বিসর্জন দিয়ে সালাফীরা নিয়মিতভাবে অন্য মুসলিমদেরকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করেন। আসারী ধর্মবিশ্বাসের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে মজবুত সম্পর্কে গড়ে তোলা। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কে বিশ্বাস কেবল এরকম হওয়া

উচিত নয় যে, তাঁর হাত আছে কি নেই, কিংবা তার সুবিশাল আসনের ধরন কীরকম সেটা নিয়ে তর্কাতর্কি করা। তাওহীদ তো সেটাই যা আমাদেরকে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণের ব্যাপারে মনে করিয়ে দেয়; কীভাবে তাঁকে সঠিকভাবে ‘ইবাদাত করা যায়, আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা যায় সেগুলোর ব্যাপারে উজ্জীবিত করে তোলে। এসব সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলি যেসব কাজের দিকে ইঙ্গিত করে সেগুলোর প্রতি অনুপ্রাণিত করাই তাওহীদের কাজ। সঠিক তাত্ত্বিক আকিদা ধারণ করা মানেই এই না যে, এটা কাউকে বেশি ধার্মিক মুসলিমে পরিণত করে। এই বিষয়টা মাথায় রাখলে বেশি ভালো হবে যে, সাধারণ মুসলিমকে আকিদার সাধারণ বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না। কিন্তু ফার্‌দ (অত্যাবশ্যকীয়-ফরজ) ‘ইবাদাত এবং আধ্যাত্মিকতার মাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

২. তাযকিয়াতুন-নাফ্‌সের ব্যাপারটা গ্রহণে দ্বিধা এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপারে সামান্য আগ্রহ। এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, সঠিক আধ্যাত্মিকতা বা তাযকিয়াতুন-নাফসের প্রতি জোর দেওয়ার ব্যাপারে সালাফীরা ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু এটা একটা কুর’আনিক ধারণা। আর এর উপর ঐকমত্যও আছে। জিবরীল (আ)-এর বিখ্যাত হাদীসের ইহসানের ব্যাপারটা তাযকিয়াতুন-নাফ্‌স ছাড়া আর কী? আধ্যাত্মিক পবিত্রতার মৌলিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে জার্‌হ ওয়াত-তাদীল-এর মতো উচ্চতর জ্ঞান নিয়ে আবিষ্টতার কারণে ‘সালাফি-নিঃস্বতা’ চেপে ধরে অনেককেই। যার ফলে দেখা যাচ্ছে অনেক সালাফীই সালাফি চিন্তা ত্যাগ করছেন এবং হয় অন্যান্য ইসলামি ধারায় যোগ দিচ্ছেন (সাধারণত সুফি ধারা যা সালাফী ধারায় যা ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করে), নয় ইসলাম চর্চা করাই ছেড়ে দিচ্ছেন একেবারে।

৩) সালাফী নন এমন মুসলিমদের ব্যাপারে রূঢ় মনোভাব। সালাফীদের বিশ্বাস তাদের পথই একমাত্র পরিত্রাণের উপায়।[১৭] এ ধরনের মনোভাব নিঃসন্দেহে সাধারণ সালাফীদের মধ্যে উদ্ধতা ও অহংকারের জন্ম দেয়। এটা খারিজীদের ধর্মীয় অহংকারের ইঙ্গিতবাহী (তবে হুবুহু নয়)।

এটি পথভ্রান্ত দল এবং তাদের বিচ্যুতির ব্যাপারে অসমানুপাতিক গুরুত্ব প্রদানকে ব্যাখ্যা করে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি এক অযৌক্তিক পরিণাম ডেকে এনেছে। কিছু সাধারণ সালাফী সঠিক ধর্মবিশ্বাস জানার চেয়ে বিপথগামী দলের বিশ্বাস সম্পর্কে বেশি জানে। মাদখালীরা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইসলামে ফিরে আসা নতুন যারা মাদখালী ধারায় প্রবেশ করেন তাঁরা বেশ সহজেই বলতে পারবেন কোন কোন ‘আলিম সালাফী মানহাজ অনুসরণ করছেন আর কারা করছেন না। কিন্তু সমপরিমাণ সাহাবীদের নাম বলতে বললে তাঁদেরকে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হবে। একজন বিপথগামী মতের অনুসারীকে কীভাবে অভিবাদন জানাতে হবে সেটা তাঁরা যতটা ভালোভাবে বলতে পারবেন, ঠিক ততটাই উল্টো অবস্থা সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌রের ব্যাপারে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এই প্রবণতা শুধু মাদখালী-সালাফীদেরই একক বৈশিষ্ট্য নয়। সালাফীদের উচিত তাঁদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা: ইসলাম কি শুধু অন্যের ভুল বের করা নিয়েই আচ্ছন্ন? নাকি উত্তম কাজ তুলে ধরার অনুকরণীয় আদর্শ হওয়াটা ইসলামের মূল লক্ষ্য? “তিনিই ভাগ্যবান যিনি অন্যের ভুল ধরার চেয়ে নিজের ত্রুটি (সংশোধন) নিয়ে ব্যস্ত।” (মুসনাদ আল-বাযযার)

৪) অনেক সালাফী ধারা বিদ‘আহ ও মুবতাদ‘ই (যারা বিদ‘আত করেন) তাদের নিয়ে প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করেন। এটা অনেক মুসলিমদের কাছে তাঁদেরকে হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মাসজিদে কার্পেটের উপর কাতার সোজা করার জন্য দাগ দেওয়াটাকে বিদ‘আত মনে করাটা যে অতিমাত্রায়-আক্ষরিক সেটা সাধারণ মুসলিমও বুঝতে পারেন।

আরেকটি ইস্যু হচ্ছে ‘বিপথগামী ব্যক্তি’র সঙ্গে আচরণ। বিপথগামী দলগুলোর ব্যাপারে সালাফদের উক্তিকে তাঁরা কুর’আন-সুন্নাহর সমমানের হিসেবে বিবেচনা করেন। তা সত্ত্বেও, বিদ‘আতিদের সঙ্গে কোনো সালাফ যে আচরণ করেছেন তা অবশ্যই কুর’আন-সুন্নাহর আলোকে এবং সেই সময়ের প্রসঙ্গের আলোকে বুঝতে হবে। ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের নবী (সা) যে রূপরেখা দিয়েছেন, সেটা যেকোনো নির্দিষ্ট ‘আলিমের বক্তব্যের ঊর্ধ্বে। আর যারা বিপথে গিয়েছেন তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে তা সময়, স্থান, ব্যক্তিবিশেষ, বিপথগামিতার পরিমাণ ও প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে। সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে দোষ–ইসলাম এটা প্রচার করে না। সালাফদের রায়কে তাঁদের ইজতিহাদ হিসেবে বুঝতে হবে। এগুলো তাদের পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য ও বৈধ ছিল। বর্তমান সময়ের সালাফীদের বুঝতে হবে যে, একবিংশ শতাব্দির আমেরিকা (অথবা ইংল্যান্ড - এবং হ্যাঁ বার্মিংহাম শহরও এর অন্তর্ভূক্ত) সপ্তম শতকের বাগদাদ নয়। আল-কুর’আন ও সুন্নাহর স্পষ্ট পাঠ যেখানে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের তাগাদা দেয়, সেখানে সালাফদের ফাতওয়ার অপপ্রয়োগ অনৈসলামিক এবং অবিবেচনাপ্রসূত। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সালাফীদের নিয়ে দুর্নাম আছে যে, তাঁরা বিভিন্ন কমিউনিটিতে বিভাজন সৃষ্টি করেন, ঢালাওভাবে কোনো নির্দিষ্ট দলকে তাকফীর করেন এবং যারা তাঁদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন না তাদের সাহচর্য এড়িয়ে চলেন।

৫. ভুল অগ্রাধিকার। নবী মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, “যা-তে কল্যাণ তাতে মনোনিবেশ করো!” কোনো কোনো সালাফীদের কাছে

সফলতা মানে বিপথগামীদের খণ্ডন করা। অন্যান্যদের খণ্ডনে সময় খরচ করে, ‘বিপথগামী’ দের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা নিয়ে মানুষকে সতর্ক করে এবং মানুষকে শোধরাতে যেয়ে আক্রমণাত্মক রূঢ় শব্দের ব্যবহারে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলির অপব্যাখ্যা কিংবা মিলাদ উদযাপনের বৈধতা[১৮] বর্তমান মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নয়। সন্দেহ নেই, কোনো কোনো সময় মিলাদের বৈধতা, আল্লাহর গুণাবলি এবং ঈমানের অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা জরুরি। **কিন্তু এগুলো আমাদের বর্তমান সময়ের মূল সমস্যা নয়। আমাদের তরুণ-তরুণীদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এগুলো মূল চ্যালেঞ্জ নয়।** অতীতের বিতর্ক এগুলো। সালাফী এবং আশ‘ আরীরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক চালিয়ে যেতেই পারেন। এবং আমি নিজেও একজন ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে সঠিক ফোরামে, উপযুক্ত শ্রোতাদের সামনে এসব বিতর্কে অংশ নিতে বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করব। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ তরুণ-তরুণী এসব বিমূর্ত ধারণার সামান্যই পরোয়া করে। তারা তাদের ঈমান ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। ডারউইনের মতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ, মানবতাবাদ এবং উদারতাবাদের মতো হাজারো ‘বাদ’-এ জর্জরিত তারা। অন্যদিকে সালাফী (এবং দেওবন্দি, আশ‘ আরি ও সুফীরা) নিজেদের মহলে যেসব বিষয় নিয়ে তর্কে ব্যস্ত তা নিয়ে হয়তো মাত্র ০.১% মানুষ মাথা ঘামায়।

ইসলাম র‍্যাডিকাল সেকুলারিজম থেকে অভূতপূর্ব ভাবাদর্শিক আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে ইসলামকে এবং সাধারণভাবে ধর্মীয়তাকে ঘৃণিত হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। নব্যনাস্তিকতাবাদ এবং বৈজ্ঞানিকতাবাদের চল বাড়ছে পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালদের মাঝে। আধুনিক সমাজ ভোগবাদিতা, সুখবাদিতা, অশ্লীল ছবি ও ভিডিও এবং যৌন সুরসুরির দুর্গন্ধে ভুরভুর করছে। র‍্যাডিকাল ফেমিনিজমের মতো চরমপন্থী ভাবাদর্শ প্রচুর পাওয়া যাবে। সত্য বলতে সালাফীদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ‘আলিমদেরই পাওয়া যাবে যাঁরা এগুলো নিয়ে কথা বলার যোগ্য; খণ্ডন তো পরের কথা। এমন কোনো ‘আলিম যদি পাওয়া যায়ও, সেটা সালাফী প্রশিক্ষণের কারণে না। কিন্তু সালাফী প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও সে এরূপ চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম।

যুগ-যুগান্তরের সামাজিক যেসব অবক্ষয় রোধে ইসলামের আগমন সেগুলো ‘মুসলিম বিশ্বে’ এখনো মহামারীর মতো। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা অবাধে চলছে। পারিবারিক নির্যাতন, যৌননির্যাতন, শ্রমিকের অধিকার খর্ব, বর্ণবাদ, ঘুষ ইত্যাদি আরো অনেক কিছু বেড়েই চলেছে। কিন্তু এসবকিছুকেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফাকীহ্দের কাছে এ ব্যাপারে কোনো অজুহাত থাকতে পারে না যে, একদিকে তাঁরা নারীদেরকে গাড়ি চালনা থেকে বিরত রাখার ফাতওয়া প্রবল উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করে বেরাবেন কিংবা মিলাদের বৈধতাকে লাগাতার সমালোচনা করে যাবেন, কিন্তু বিদেশি শ্রমিকদের সঙ্গে অসদাচরণ, নারী গৃহকর্মীদের যৌনস্বার্থে ব্যবহার, ঘুষ, ওয়াসিতা (যথাযথ জায়গায় এমন একজন 'বন্ধু' থাকা যে সহযোগিতা করবে) এবং সমাজে বহুল প্রচলিত অন্যান্য অনাচারের বিরুদ্ধে চুপ থাকবেন।[১৯]

যে ইসলাম অত্যাচিরত ও নিপীড়িত ব্যক্তির অধিকার নিয়ে কথা বলে না সেই ইসলাম আমাদের প্রিয় নবী (সা)-এর সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে। কেননা বিদায় হাজ্জের ভাষণে দেওয়া উপদেশমালার মধ্যে অন্যতম ছিল সমাজের দুর্বল ব্যক্তির অধিকার পূরণ করা।

৬) নারীদের ব্যাপারে সালাফী মনোভাব। সালাফী আন্দোলন নারীদেরকে যে পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে সেটাকে অমানবিক বলা যায়। এর সহজ উদাহরণ হচ্ছে, নিজের স্ত্রী বা প্রিয় বন্ধুর স্ত্রীর নাম মুখে আনাটা আপত্তিজনক[২০]-এ ধরনের মনোভাব। যদি কোনো নারীর নাম মুখে আনাটা নিষিদ্ধ হয়, তাহলে সেই সমাজে নারীর ভূমিকা কী হবে? চরমপন্থী নারীবাদী ব্যাখ্যার বিপরীতে আজকের সময়ে আমাদের এমন সব মেধাবী ও বিচক্ষণ মুসলিম বোনদের প্রয়োজন যারা এই ধর্মের বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কেবল সাউদি নারীদেরকে গাড়ি চালানোয় নিষিদ্ধ করাতেই নারীদের প্রতি অবনমিত মনোভাব সীমিত নয় (অবিশ্বাস্য হলেও সত্য অধিকাংশ সাউদী সালাফী উলামা আজো পর্যন্ত ইসলামের অংশ হিসেবে একে নিষিদ্ধ মনে করে)। দুঃখজনকভাবে পশ্চিমা সালাফিজমের কিছু কিছু অংশ ধারাবাহিক বিয়ে ও তালাক, সিঙ্গেল মায়েদের পরিস্থিতির সুযোগে নেওয়া, শিশু জন্ম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া, ব্যভিচার এগুলোর ব্যাপক উপদ্রবের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে। এটা ছিল ছোট একটা ধারার মধ্যে, নির্দিষ্ট কিছু আমেরিকান ও ব্রিটিশ সালাফী ধারার মধ্যে। এটা এমন এক বাস্তবতা যা কোনো ‘আলিমই বৈধতা দেবেন না। কিন্তু তারপরও এই নজিরগুলো এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তা উপেক্ষা করার জো ছিল না। নারীদের ব্যাপারে সালাফীদের মনোভাব এবং সঠিক তারবিয়্যার যে কতটা অভাব, তা এ থেকে বোঝা যায়।

৭) ‘বয়োজ্যষ্ঠ ‘আলিমদের’ দের প্রতি প্রশ্নবিহীন আনুগত্য যারা সব বিষয়ে চূড়ান্ত নিয়ন্তা হিসেবে কাজ করেন। যে আন্দোলন মুক্তচিন্তাকে উৎসাহিত করে এবং অন্ধ-অনুসরণকে নিন্দা করে, সে আন্দোলনের অনুসারী অধিকাংশ সালাফীদের জন্য দলীয় চিন্তা এবং ‘কিবার’ (বয়োজ্যষ্ঠ ‘আলিমদের) অনুসরণে সংকীর্ণমনতা দুঃখজনক। যেহেতু ‘কিবার’ রা সাধারণত একটি জাতীয়তার এবং

সরকার নিযুক্ত, সেহেতু শিষ্টাচারসম্পন্ন আলোচনায় তাদেরকে খুব কমই পাওয়া যায়। ইসলামে এমনকি আসারী ধর্মবিশ্বাসেও আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছার ঐশী প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট অভিভাবক নিয়োগ করেননি। যত বয়োজ্যষ্ঠই হোক, কোনো একদল ‘আলিমের মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা মানেই এই না যে, এতে করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা হলো।

আমাদের নবী (সা) বলেছেন, “‘আলিমরা নবিদের উত্তরাধিকারী।” আল্লাহ না-করুক, ইসলামি জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমি তর্ক করছি না। আমি এমনটাও দাবি করছি না যে, জ্ঞানী স্কলারদেরকে সাধারণ তালিবে ইলম শর্তহীনভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। যেটা নিয়ে আমার আপত্তি সেটা হচ্ছে ‘আলিমদের কেবল নির্দিষ্ট, সমমনা, ও এক জাতির ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমিত করে ফেলা। ইসলামে বহু ‘আলিম আছেন। এবং সব জাতিগোষ্ঠীর মাঝেই তাঁদের উপস্থিতি আছে। বহুমুখী এসব ‘আলিমদের কাছ থেকে তাঁদের বিশেষত্ব অনুযায়ী জ্ঞান নেওয়ার ব্যাপারে সালাফীদের মন প্রশস্ত হওয়া উচিত।

সালাফীদের এটা স্মরণে রাখা উত্তম যে, ইবনে তাইমিয়্যার সময়ে তাঁর সবচেয়ে কড়া সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন সমসাময়িক হানবালি 'আলিমরা (অষ্টম শতকের দামেস্কের ‘কিবার’)। যে লেখনী ধারা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁরা অভ্যস্ত ইবনে তাইমিয়্যা কেন সেটা বদলাতে চাইছেন তাঁরা তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

৮) আধুনিক রাজনৈতিক বিষয় বুঝতে মারাত্মক অক্ষমতা। এটা খুবই আশ্চর্জনক যে, যাঁরা নিজেদের ইব্ন তায়মিয়্যার অনুসারী বলে দাবি করেন, এবং তাঁর লেখা সরাসরি পড়তে পারেন, সেই ইবনে তাইমিয়্যা যেখানে প্রকাশ্যে তৎকালীন শাসকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, সেখানে আজকে তাঁর অনুসারীরা শাসকদের ব্যাপারে কীভাবে শান্তিপ্রিয় ক্রীতদাসসুলভ আজ্ঞাবহ মনোভাব গ্রহণ করেন। অথচ বর্তমান সময়ের শাসকদের অপরাধের মাত্রা ইবনে তাইমিয়্যার সময়ের শাসকদের অপরাধের মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

আমি এসব ‘আলিমদের বলছি না যে, আপনারা গৃহযুদ্ধের ডাক দিন। আমি বলতে চাইছি যে, একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন জরুরি। যেখানে সাধারণের অধিকার খর্বকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হবে। ইসলাম দাবি করে যে, ‘আলিমরা শাসকদেরকে নজরদারিতে রাখবেন। উল্টোটা নয় [অর্থাৎ শাসকরা ‘আলিমদেরকে নজরদারিতে রাখছেন]। বর্তমানে যা দেখা যায়, মূলধারার অধিকাংশ সাউদি সালাফীদের অবস্থান হচ্ছে, বর্তমান শাসকদের যেকোনো সমালোচনা ধর্মীয় বিপথগামিতার সমান। আমি যখন এই লাইনগুলো লিখছি, তখন সেই অঞ্চলের শাসকবর্গ মুসলিম ব্রাদারহুড ও তাদের সমর্থকদের ব্যাপারে বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছেন। ভয়ংকর এই অবিচারের ব্যাপারে ‘আলিমদের নীরবতা কানে তালা লাগার মতো। মূলধারার মিশরীয় সালাফীদের একটি গোষ্ঠীর অবস্থান যা নূর পার্টির মধ্যে লক্ষ্যণীয় এবং জেনারেল সিসির শাসনের প্রতি তাদের যে সমর্থন তা এতটাই দুঃখজনক যে এমন অবস্থান খন্ডন করারও প্রয়োজন পড়ে না। এ ধরনের অবস্থানের আরও অনেক নজির রয়েছে।

উপসংহার

রাশিদ রিদা (মৃত্যু ১৯৩৫ সাল) সর্বপ্রথম ‘সালাফী’ শব্দটি জনপ্রিয় করেন। তিনি নিজে যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তার পরিচয় তুলে ধরতে তিনি এই শব্দ ব্যবহার করেন। এই আন্দোলন মাযহাবগুলোর কাঠামোবদ্ধ চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ফিক্হ ও আধুনিকতার স্ট্যান্ডার্ড ইস্যুগুলোর মাধ্যমে চিন্তার নবায়নের কথা বলে যা মাঝেমধ্যে বেশ উদারভাবেই সংগঠিত হয়েছে। আল-আলবানী নামে একজন তরুণ উদীয়মান এক ‘আলিম রিদার লিখিত একটি প্রবন্ধ পড়েন। এবং তিনি সেই শব্দটিকে নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দেন। অপ্রত্যাশিতভাবে রিদা যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেটা ক্রমে মডার্নিস্ট ইসলামে রূপ নেয় এবং ‘সালাফী’ লেবেল খুইয়ে বসে। আল-আলবানী যে ফিক্হী কর্মপদ্ধতির ঝাণ্ডা তুলে ধরেন সেটা ‘সালাফী’ অভিধা ধরে রাখে। একপর্যায়ে নাজদি দা’ওয়াহ আল-আলবানীর লেবেল গ্রহণ করে। এবং সেই আন্দোলনের সব ধারায় ছড়িয়ে পড়ে। অন্যথায় এই শতকের আগে ‘সালাফী’ শব্দটি সচরাচর ব্যবহৃত কোনো শব্দ নয়। সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়নি।[২১] কাজেই, ‘সালাফী’ অভিধা একটি আধুনিক টার্ম। প্রাচীন আসারী আকিদার সঙ্গে একে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি মনে করি, ইসলামের অন্য সব আন্দোলনের মতো সালাফী আন্দোলন মানুষের হাতে গড়ে উঠা একটি আন্দোলন। কারণ, আল্লাহ ‘সালাফী আন্দোলন’ নাজিল করেননি। বরং তিনি অবতীর্ণ করেছেন আল-কুর’আন। আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন একজন নবী (সা)। যাঁরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা যেমন মানুষ তেমনি সালাফী আন্দোলনও মানুষের হাতে গড়া। এর মানে হচ্ছে এই আন্দোলনের ভুলগুলো এর মানুষেরই। এটা আরও ব্যাখ্যা করে যে, কেন কোনো ‘একটি’ নির্দিষ্ট সালাফী আন্দোলন নেই।

বরং অনেকগুলো আন্দোলনের সংগ্রহ, যেগুলোকে সালাফিজ্‌মের অধীনে জড়ো করা যায়। আমি বিশ্বাস করি, কোনো একটি আন্দোলনই বলতে পারবে না যে, তাঁদের বুঝই ইসলামের 'সঠিক' বুঝ। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, কিছু কিছু আন্দোলন সত্যের দিক থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে বেশি এগিয়ে, কিন্তু প্রতিটি আন্দোলন মানুষের হাতে গড়ে তোলা এবং তা ভুলের উর্ধে নয়। আমি বিশ্বাস করি না যে, সত্যের ব্যাপারে কোনো একটি গোষ্ঠী বা আকিদার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে সালাফী আন্দোলনের অবশ্যই কিছু মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু এর মধ্যে এমন অনেক ভুলও আছে যেগুলোকে তারা এড়িয়ে যেতে পারেন না। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, "এটা কি সম্ভব না যে, সালাফী চিন্তা থেকে সব নেতিবাচকতাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে, শুধু ইতিবাচক দিকগুলোকে ধরে রেখে উন্নততর অবস্থার দিকে একে নিয়ে যাওয়া?" এই আন্দোলনের অনেকেই তা করছেন। এবং আমি সততার সঙ্গেই সালাফী ধারা ও ইসলামি অন্যান্য ধারাতে তাদের শোধরানোর চেষ্টাকে সমর্থন করি। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, পদ্ধতিগতভাবে যখন প্রচুর ভুল ও নেতিবাচকতা এই লেবেলের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, আর শুরুতে এই আন্দোলনের যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা যখন হারিয়ে গেছে, তখন কেন এই লেবেলের আশ্রয় নেওয়া? কেননা স্বকীয়ভাবে এই লেবেলের কোনো ধর্মীয় মূল্য নেই। আর ইসলামের ইতিহাসে এই লেবেলের জনপ্রিয়তা বেশি দিনের নয়।

এ কারণেই উপরোক্ত একটি সেকশনে যেসব সালাফী ধারার কথা বলা হয়েছে, আমি নিজেকে তার কোনোটারই অংশ বলে মনে করি না। যাঁরা এখনো এই লেবেলের অধীনে নিজেদের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, আমি দু'আ করি তাঁরা উপরে উল্লেখকৃত এই আন্দোলনের ত্রুটিগুলো শনাক্ত করবেন এবং সেগুলো শোধরানোর চেষ্টা করবেন। যাঁরা এই খেতাব এড়িয়ে চলতে চান, সেটা করার সব অধিকার ও কারণ তাঁদের আছে। যেকোনো একটি লেবেলের চেয়ে ইসলাম অনেক বড়।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অবিরাম গবেষণার পর আমি আসারী আকিদা অনুসরণ করি বটে-কারণ এটা আমার মতে সবচেয়ে নিরাপদ ও সবচেয়ে বিশুদ্ধ আকিদা-**তবে ইসলাম কেবল বুলেট-পয়েন্ট সর্বস্ব কোনো বিশ্বাসব্যবস্থা নয়**। আমার চূড়ান্ত আনুগত্য কোনো মানুষ কর্তৃক আহরিত আকিদার প্রতি নয় বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তারপর যেসব ব্যক্তির মনে খাঁটি ঈমান ও তাকওয়া আছে তাঁদের প্রতি। এজন্য একজন কট্টর সালাফীর চেয়ে একজন মধ্যমপন্থী দেওবন্দি তাবলিগী মাতুরিদীর সঙ্গে আমি বেশি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও ভ্রাতৃত্ব অনুভব করি। কারণ, একজন কট্টর সালাফী যেখানে আমার প্যান্টের দৈর্ঘ্য এবং আমি 'কিবার' দের থেকে উদ্ধৃতি দিই না কেন এসব নিয়ে আমার পিছে লেগে থাকবেন, সেখানে একজন মধ্যমপন্থী দেওবন্দী তাবলিগী মাতুরিদীর সঙ্গে হয়তো কিছু ফিক্‌হী এবং আকিদাগত ও পদ্ধতিগত বিষয়ে দ্বিমত থাকবে। কিন্তু তাঁর ধার্মিকতা এবং উম্মাহর জন্য তাঁর উদ্বেগের সঙ্গে আমি পুরোপুরি সহানুভূতিশীল। একজন মধ্যমপন্থী সুফী হয়তো আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিশ্বাসী হিসেবে দেখবেন, যদিও আমাদের মধ্যে হয়তো তুচ্ছ বিষয়ে কিছু পার্থক্য থাকবে। কিন্তু একজন কট্টরপন্থী সালাফী তাঁর পূর্বধারণাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে আমাকে হয়তো একটি গৎবাঁধা ছকে ফেলবেন। এবং তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে 'আমার বিরুদ্ধে সতর্ক করা'।

কট্টরপন্থী সালাফীর সঙ্গে আমি যদিও একমত হব যে, আল্লাহ তাঁর আর্‌শে আরোহণ করেছেন সেভাবে, ঠিক যেভাবে তাঁর জন্য শোভা পায়, কিন্তু উম্মাহর বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে সেই সালাফীর অদূরদর্শী সংকীর্ণমনতা এবং আত্ম-ন্যায়নিষ্ঠার দাম্ভিকতা ও দলীয় মনোভাব ব্যক্তিগতভাবে তাঁর থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আর গোটা উম্মাহর জন্য এটা আরও বিপজ্জনক। এজন্য একজন গোঁড়া সালাফী-যাঁর ধার্মিকতার প্রমাণ মেলে কেবল 'আকীদাহ্‌র বিষয়ে কথা বলে এবং বিপথগামীদের খণ্ডন করে-তাঁর চেয়ে, একজন মধ্যমপন্থী সুফীর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করি, যিনি আমার চেয়ে বেশি কুর'আন পড়েন আর হালাল রোজগারের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি সচেতন। তার মানে এই না যে, সেই সুফী তাঁর আকিদার ক্ষেত্রে 'সঠিক'। এটা শুধু এরই ইঙ্গিতবাহী যে, কিছু কিছু ইস্যুর চেয়ে ইসলাম ও ইসলামি আনুগত্য অনেক বৃহৎ।

শেষ একটি পয়েন্ট এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসক্লেইমার:

সালাফীদের বিরুদ্ধে যাদের মনের মধ্যে বহুদিন ধরে আক্রোশ চেপে ছিল, তারা সুযোগ পেয়ে, এই আন্দোলনের কুৎসা রটনার জন্য এই প্রবন্ধটিকে ব্যবহার করবে। আসলে এটি সব ইসলামি ধারার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে: প্রগতিবাদী এবং আধুনিকতাবাদী থেকে শুরু করে শিয়া, সুফী ও আশ'আরী সবার মাঝেই। আমার মতো একজন-যে কিনা এই আন্দোলনের সঙ্গে একসময় জড়িত ছিল-সে যখন এই ধারার ভুলগুলো তুলে ধরেছে তখন অন্যান্য দলগুলো এ নিয়ে আনন্দ করবে। যারা উল্লাস করতে চান তাঁরা এটা জেনে রাখুন যে, আমার আকিদা দুদশক আগে যা ছিল এখনো তা-ই। আর সালাফী চিন্তার মতো আপনাদের আন্দোলনও মানুষের হাতে গড়ে তোলা আন্দোলন।

অন্যকথায় আমি বিশ্বাস করি, ইসলামি প্রতিটি আন্দোলনই মানুষের হাতে গড়ে উঠা আন্দোলন। সবগুলোরই যেমন ইতিবাচক দিক আছে, তেমনি আছে নেতিবাচক দিক। অন্যদিকে কোনো কোনো আন্দোলন হয়তো নবির সুন্নাহ অনুসরণের দিক দিয়ে অন্য আন্দোলনের চেয়ে বেশি নিকটে। যেহেতু সব আন্দোলনের নেতৃত্বস্থানে 'আলিম আছেন যারা মানুষ, সেহেতু কেউই এই দাবি করতে পারবেন না তারাই আমাদের নবী (সা)-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং অফিসিয়ালি পৃথিবীতে আল্লাহর ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। সব আন্দোলনের মধ্যে 'আকীদাহ্‌র ক্ষেত্রে সালাফীদের বেশ কিছু ভালো ভূমিকা আছে। কিন্তু তাই বলে ইসলামের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরাই সবচেয়ে সঠিক এমনটি ভাবা ঠিক নয়। তাঁদের ভালোটা আমাদের নেওয়া উচিত। এবং যখনই সম্ভব তাঁদের ভুল শোধরানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। আর অবশ্যই সেটা বিজ্ঞতার সাথে ও নম্রভাবে। এই আন্দোলনের মধ্যে থেকেই যাঁরা একে শোধরাতে চান, তাঁদের প্রতি আমার দু'আ রইল। কিন্তু আমাদের সবারই যার যার ঘরানা রয়েছে। এবং আমি নিজেকে বৃহত্তর উম্মাহ্‌র কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করাতেই বেশি উপকার আছে বলে মনে করছি এবং এর মাঝেই আমি অধিক উৎসাহ খুঁজে পাই।

ডিসক্লেইমার প্রসঙ্গেঃ এই আন্দোলনের প্রতি সবসময় আমার শ্রদ্ধা থাকবে। কারণ এটিই আমাকে গড়ে দিয়েছে। আমি এর 'আলিমদের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি। কর্মপদ্ধতিগত কিছু ইস্যুতে তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেও আন্তরিকভাবে আমি তাঁদের প্রশংসা করি। কাজেই কেউ যদি মনে করেন এই প্রবন্ধে অযাচিত রূঢ়ভাবে কিছু বলা হয়েছে, তাহলে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ, অপমান করা বা কুৎসা রটানো আমার উদ্দেশ্য না। যদিও কোথাও রূঢ় মনে হয় তা হয়তো এ কারণে যে, যেই আন্দোলন নিজেদেরকে সালাফদের অনুসারী বলে দাবি করে, আমি তাঁদের কাছ থেকে আরও ভালো আশা করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা সেই মহৎ লক্ষ্য থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। এটা আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যে, আমাদের ধর্ম যে পবিত্র আদর্শের দিকে আহ্বান করে এবং নবী (সা) যেভাবে দেখিয়ে গেছেন, সাধারণভাবে সব ইসলামি আন্দোলন এবং বিশেষ করে সালাফী আন্দোলন যেন সেটা অর্জন করতে পারে।

পরিশেষে বলব, আল্লাহর কথাই সবচেয়ে সেরা কথা। সেরা দিকনির্দেশনা হচ্ছে তাঁর রাসূলের দিকনির্দেশনা। সব ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিক মুসলিমরা, সালাফী ও অসালাফী আমাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছেন সবচেয়ে সেরা কথা ও সেরা দিকনির্দেশনা বুঝতে ও প্রয়োগ করতে।

সমালোচকদের প্রতি: এই প্রবন্ধ থেকে কোনো একটি বাক্য নিয়ে সেটাকেই আমার সামগ্রিক মত হিসেবে তুলে ধরাটা অনৈসলামিক। প্রসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা নাহলে এমনকি কুর' আন-সুন্নাহও ভুল বোঝার অবকাশ আছে। নির্দ্বিধায় দ্বিমত করুন। কিন্তু অনুগ্রহ করে পুরো প্রবন্ধের লিংক জুড়ে দিন। শিক্ষিত পাঠককে আমার পুরো প্রবন্ধ পড়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিন। তাঁদের সালাফী আন্দোলনের সমালোচনার পাশাপাশি আমার প্রশংসাগুলোও দেখতে দিন এবং সর্বশেষে আমার ডিসক্লেইমার।

ফুটনোটঃ

[১] ভারতীয় উপমহাদেশে আহলে-হাদীস আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ছিলেন সিদ্দীক হাসান খান।

[২] দুর্ভাগ্যজনকভাবে এক্ষেত্রে একজন সাধারণ ব্যক্তিকে ধর্মীয় মত প্রদানের (তারজীহ) দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। অথচ এসব ব্যাপারে জড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দক্ষতাও তার হয়তো নেই।

[৩] সালাফী আন্দোলনকে যারা ঘৃণা করেন, তারা কখনো কখনো এই আন্দোলনটিকে 'ওয়াহাবী' নামে অভিহিত করেন। এটাকে অবমাননাকর হিসেবে এবং অপবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে এই প্রবন্ধে এটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আর তাছাড়া আল্লাহর নামের সঙ্গে (অর্থাৎ আল-ওয়াহহাব) কোনো অবমাননাকর অভিধা জুড়ে দেওয়া কোনো মুসলিমদের জন্য সংগত নয়।

[৪] 'সাহওয়া'' আলিম শাইখ সাফার আল-হাওয়ালি তাঁর যাহিরাত 'আল-ইরজা' শিরোনামে একটি খণ্ডনপত্রে যখন এ বিষয়ে আল-আলবানীর অবস্থানের সমালোচনা করেন তখন বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। তিনি অভিযোগ করেন, আল-আলবানী মুরজি' আদের (ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি আকিদাগত ফিরকা। তাদের বিশ্বাস ঈমানের সঙ্গে আমলের সম্পর্ক নেই) বিচ্যুতপথের দিকে ঝুঁকে গেছেন। এতে করে ৯০-এর শেষের দিকে সালাফীদের দুটো ধারার মধ্যে ব্যাপক ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই দুটো ধারা ছিল মূলধারার সাউদি সালাফী এবং শাইখ আল-আলবানির নেতৃত্বাধীন জর্দানীয়-আলবানী ধারা। এই ফাটল এখনো

পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি । তবে এক দশক আগে এর যতটা গুরুত্ব ছিল এখন আর তা নেই।

সাহওয়া শব্দটি যে শব্দ থেকে এসেছে তার অর্থ ‘সক্রিয়তা’। ১৯৯০ সনের গোড়ার দিকে উত্তেজনাপূর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং প্রথম উপসাগারীয় যুদ্ধের পর তাদের আবির্ভাব। এটি দ্বারা সাউদি সালাফী গ্রুপের অধিকতর রাজনৈতিকভাবে বেশি সক্রিয় ধারাটিকেই বুঝায়। সাহওয়া ‘আলিমগণ এই যুদ্ধ এবং আমেরিকানদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। এতে করে মূলধারার সাউদি ‘আলিমদের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়। কারণ এদের একপক্ষ চেয়েছিলেন শাসকরা আমেরিকান সেনা মোতায়েনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা।

মাদখালীরা সাহওয়া ‘আলিমদের ব্যাপারে সাউদলি সালাফীদের থেকে ভিন্ন অবস্থান নেন। তাঁরা অবমাননাকরভাবে এই ধারাকে ‘কুতবি’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধারার ওপর সাইয়্যেদ কুতুব ও তাঁর ভাই মুহাম্মাদ কুতুবের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব ছিল বলে তাঁরা এই তকমা দেন। মুহাম্মাদ কুতুব ছিলেন সাফার আল-হাওয়ালীর একজন উপদেষ্টা (শাইখ সাফারকে সাহওয়া দলের 'প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে বিবেচনা করা যায়)।

[৫] সালাফী ঘরানার বাইরের অনেকেই এই অবস্থানের পেছনের কারণ বুঝতে পারেন না। এবং দাবি করেন সাউদি সরকার তাদের ‘অর্থায়ন’ করেন। অর্থায়ন যদিও একটা ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু যেসব অ-সাউদি সালাফীরা এই অবস্থান গ্রহণ করেছেন তাঁরা সাউদি তেলসম্পদ থেকে কোনো সাহায্য পাননি। কাজেই এই আন্দোলনের প্রতি ন্যায্য থাকতে গেলে বলতে হবে, ক্ল্যাসিকাল সুন্নী মতবাদ ‘বৈধ শাসকের আনুগত্য’-এর উপর ভিত্তি করে তাঁরা এই অবস্থান নিয়েছেন। এখানে বলে রাখি আমি এই ধরণের মতকে ধর্মীয়ভাবে সমর্থনযোগ্য মনে করি না এবং এটি একিসাথে নৈতিকতারও পরিপন্থী। এই বিশ্বাসের সঙ্গে এটাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকাশ্যে বৈধ শাসকের সমালোচনা করাও নিষিদ্ধ। তাছাড়া, অধিকাংশ সদস্যদের মধ্যে একটা প্রকাশ্য অনুভূতি দেখা যায় যে, বিভিন্ন ত্রুটি সত্ত্বেও সাউদি রাজতন্ত্র ‘তাওহীদ ও সুন্নাহর রক্ষক’। কাজেই অন্যান্য ঘাতের বিপরীতে বাকি সব দোষগুলোকে এড়িয়ে যেতে হবে। সুতরাং এই শাসকের সমালোচনা মানে তাওহীদের সংরক্ষকের সমালোচনা।

[৬] এই তাত্ত্বিক অবস্থানের নির্ঘাত পরিণাম তাকফীর করা যা সামনের আরেকটি দ্বিমতের বিষয়।

[৭] এ বিষয়ের উপর আমি একটি অ্যাকাডেমিক পত্রের উপর লেকচার দিয়েছি। এটা এই লিংকে দেখা যাবে: https://www.youtube.com/watch?v=RZoAzlnplgk

[৮] এসব প্রতিটি অভিমতের আছে সূক্ষ্ম তারতম্য এবং শর্ত। আমি এগুলোর ব্যাপারে বেশ ভালোভাবেই জানি, এবং ইচ্ছে করে এগুলো এড়িয়ে যাইনি। কিন্তু এই প্রবন্ধটি গবেষণামূলক দীর্ঘ নিবন্ধ নয়। তাই ওসব ব্যাপার নিয়ে এখানে আলোচনা করিনি। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ একটা দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। আগ্রহী পাঠকদের প্রতি পরামর্শ থাকবে তারা যেন সূক্ষ্ম তারতম্যগুলো ঘেঁটে দেখেন।

[৯] এখানে একটি বিবৃতি জরুরি: এই গ্রুপগুলো এবং এদের অবস্থান বিচ্ছিন্ন বা পুরোপুরো আলাদা নয়। তাদের অবস্থানের মধ্যে আংশিক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ‘আলিমের মধ্যে বহু উপদলের বৈশিষ্ট্যের দেখা মিলবে।

[১০] সালাফী চিন্তার মাদখালী ধারাটি বেশ কিছু কারণে দুর্বল হয়ে গেছে। প্রথমত, তাদের সালাফী ধারাটি খুব বেশি অসহিষ্ণু। গোটা সালাফী আন্দোলনের উপর এটি মারাত্মক ক্ষতি বয়ে এনেছে। এ কারণে এই ধারার সঙ্গে জড়িত নয় এমন সব সালাফী ‘আলিম (এমনকি জড়িত এমন অনেকেও) এদের মধ্যে চরমপন্থী প্রবণতাকে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, অনেকেই যারা এর অংশ ছিলেন তাঁরা হয় একে ছেড়ে গেছেন, কিংবা সালাফিজম ছেড়েছেন অথবা ধার্মিকতাই ছেড়ে দিয়েছেন। এই প্রবণতাটি এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ‘সালাফী-নিঃস্বতা’র (Salafi Burnout) মতো নতুন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বশেষ, শাসকদের প্রতি অবস্থানের কারণে ৯০ দশকের শেষের দিকে এবং পরবর্তী দশকের শুরুর দিকে মাদখালিজম সাউদি শাসকদের দ্বারা সমর্থিত ছিল। এর প্রচারণায়ও সাহায্য করেছেন তাঁরা। কিন্তু এই ধারার ক্ষতিকর দিকগুলো যখন ফুটে ওঠে, সরকার তখন এ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। পরে এটা শুধু অ-সাউদি পশ্চিমা কিছু নব্যধর্মান্তরিত এবং প্র্যাকটিসিং নয় এমন অভিবাসী মুসলিম-যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি ছিল না-তাদের মাঝে ঠাঁই পায়। এরা একে এজন্যই গ্রহণ করেছিল যে, এই ধারায় অনেক প্রসিদ্ধ ‘আলিমকে চ্যালেঞ্জ করার ‘রসদ’ খুঁজে পাওয়া যায়।

[১১] আমি এখানে অন্যান্য দেশের কথা উল্লেখ করিনি। আর উদাহরণ হিসেবে মিশরকে উল্লেখ করেছি। আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা প্রায় সব দেশেই পাওয়া যাবে। এমনকি পশ্চিমা দেশগুলোতেও। এসব জায়গায় প্রাচ্যের সালাফীদের অবস্থান তাদের পশ্চিমা

প্রতিনিধিদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ এমনটা দেখতে পাওয়া খুব একটা অবাক করার বিষয় হবে না যে, দুজন আমেরিকান ধর্মান্তরিত ব্যক্তির মধ্যে সাউদি কোনো রাজনৈতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিত সঠিক আকিদাগত অবস্থান কোনটি সেটি নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় চলছে।

[১২] আমি ব্যক্তিগতভাবে মাদখালী ও তাকফীরী সালাফীদের যে উৎকণ্ঠা তার সাথে পরিচিত। কাজেই এ দুটো আন্দোলনের ব্যাপারে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে লিখছি না। যাই হোক তাকাফীরী সালাফীদের উদ্দেশ্যে আমি বলব: আপনাদের বুদ্ধিমত্তা ও ঈমান মাদখালী ধারার চেয়ে বেশি হলেও, আপনাদের কর্মকাণ্ড ও সহযোগিতার দীর্ঘমেয়াদি পরিণাম সম্পর্কে আপনাদের বুঝে প্রজ্ঞার ঘাটতি আছে। আপনাদের সঙ্গে যারা দ্বিমত করেন তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মাদখালীদের মতো আপনারা তড়িৎ সিদ্ধান্ত নেন এবং একি সাথে রূঢ় দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেন। কোনো ব্যক্তি আপনাদের কৌশলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন মানেই এই না যে, সে ইসলামের শত্রুর পক্ষ নিয়েছে। তাছাড়া, আপনাদের দলে যারা ভেড়ে তাঁদের বয়স, সামষ্টিক পরিপক্বতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করাটা উত্তম হবে। আপনাদের দলে কেন বয়স্ক, অভিজ্ঞ লোকের অংশগ্রহণ বিরল? কেন এমন লোকের দেখা মেলা ভার, যাদের বয়স ৪০, ৫০ কি ৬০-এর কোঠায়, যারা তাদের গোটা জীবন ইসলামের তরে উৎসর্গ করেছেন এবং যাদের ঈমান ও সেবা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই? আপনারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, মুসলিমরা কীভাবে পশ্চিমে বসবাস করবে সে ব্যাপারে একজন টিনএজার বা বিশের গোড়ার দিকে যার বয়স সেসব তরুণ তাদের চেয়ে বেশি যোগ্য, যাদের বয়স তাদের থেকে দ্বিগুণ বা তিনগুণ? সবশেষে, অন্য ব্যক্তি বা ‘ আলিম সম্বন্ধে আপনারা যেসব পূর্বধারণা রাখেন সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হন। কারণ, এমনটা হতেই পারে যে, যে কারণে কোনো ব্যক্তির সমালোচনা করছেন তার মধ্যে হয়তো সেটা নেই। পরিণামে মিথ্যা অভিযোগের জন্য আল্লাহর কাছে আপনাদেরকে জবাবদিহিতা করতে হবে। যারা আপনাদের শত্রু নয়, তাদের শত্রু বানানো মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ না। এটা নিঃসন্দেহে এই দুনিয়ায় আপনাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। হয়তো পরকালেও।

[১৩] অনেকে বলেন, সুফি ধারা ও লোক-ইসলামের সঙ্গে সালাফীদের কর্মপন্থা অনেকটা সেরকম যেমনটা প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারকরা ক্যাথলিজমের সাথে করেছেন। (অবশ্যই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে)।

[১৪] ইসলামি ধর্মতত্ত্বের উপর বিশেষজ্ঞ বেশিরভাগ অমুসলিমের অভিমত এটি। ইগনাজ গোল্ডজিহার (Ignaz Goldziher) থেকে রিচার্ড এম. ফ্রাঙ্ক (Richard M. Frank), জর্জ মাকদিসি (George Makdisi) এবং জোসেফ ফন এস (Joseph van Ess)-এর সবাই এই মত পোষণ করেন। এরা যদিও আসারী আকিদাকে উড়িয়ে দেন, কারণ তাদের মতে এটা প্রকটভাবে অতিসরলীকরণের দোষে দুষ্ট। কিন্তু তারা এটা স্বীকার করেন যে, আশ' আরীদের কালাম ধারার অনেক আগে আদি এই সুন্নী মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সব প্রমাণ আশ' আরীদের বিরুদ্ধে হলেও কিছু আধুনিক আশ' আরী এ বিষয়টিতে ভুল বাস্তবতা তুলে ধরছেন। তাঁদের দাবি ইবনে তাইমিয়্যা ইসলামের নতুন এক বুঝ ‘ প্রতিষ্ঠা’ করেন। এই লাইনগুলো যখন আমি লিখছি, আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে ডজনখানেক আকিদার গ্রন্থ দেখতে পাচ্ছি। এগুলোর সবই আল-আশ‘ আরির আগে লেখা। আর এগুলোর সবগুলোতেই আল্লাহর গুণগুলো সম্পূর্ণভাবে এবং কোনো ধরনের সন্দেহের ঊর্ধ্বে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। কালামকে খণ্ডন করা হয়েছে। ইবনে তায়মিয়্যার সঙ্গে কেউ দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিক এই সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না যে, তিনি যে আকিদা প্রচার করেছেন সেটা তার অন্তত পাঁচশ বছর আগের।

[১৫] ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে আমার ডক্টরাল গবেষণামূলক প্রবন্ধের বিষয় ছিল ইব্‌ন তাইমিয়্যার ম্যাগনাম ওপাস 'যুক্তি ও ওহীর মধ্যে বিরোধ নিরসন' এর বিশ্লেষণাত্মক পাঠ। প্রায় শ' খানেক পাতার ভূমিকাসূচক অধ্যায় লিখে আমি আমার প্রবন্ধ শুরু করেছি। সেখানে আমি আশ' আরী আকিদার উত্থান দলিলসহ দেখিয়েছি। আমি দেখিয়েছি শুরুতে ছোট, সমাজচ্যুত একটা আন্দোলন হিসেবে এর শুরু। প্রথম দিকে অন্যান্য আন্দোলনের নিপীড়নের শিকার ছিল। তবে ঐতিহাসিক কারণে (কারণগুলো আমি সেখানে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছি) এক সময়ের প্রভাব বিস্তারকারী আসারী আকিদার জায়গা দখল করে নেয় এটি এবং সেলজুক ও পরবর্তী ইসলামিক রাজবংশগুলোতে অফিসিয়াল আকিদা হয়ে ওঠে। কাজেই আধুনিক আশ'আরীদের যে দাবি তাঁদের সুন্নী ইসলামের যে বোঝাপড়া সেটিই সর্বদা মূলধারা ছিল তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়।

[১৬] এ ব্যাপারে আমার যুক্তি হচ্ছে, আসারী আকিদার পৃষ্ঠপোষক ও জনপরিসরে এর প্রচারক হিসেবে ইবনে তাইমিয়্যার মতো ব্যক্তিত্বের কাউকে দিয়ে যদি আল্লাহ অনুগৃহীত না করতেন তাহলে এটা হয়তো ক্রমশ ক্ষুদ্র একটি আন্দোলনে পরিণত হতো। বলে রাখা ভাল, আমার ব্যক্তিগত মতের ওপর ইবনে তাইমিয়্যার উচ্চ ব্যক্তিত্ব এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ধীশক্তিসম্পন্ন যত ব্যক্তিত্ব আমাদের উম্মাহ দেখেছে তাঁদের মধ্যে ইবনে তাইমিয়্যা সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আমি

মনে করি। দুঃখজনকভাবে বেশিরভাগ সালাফী কেবল ইবনে তাইমিয়্যার রচনা পড়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করেন (যদিও তাঁর অনেক লেখা বোঝার যোগ্যতা তাদের নেই; বিশেষ করে হেলেনিস্টিক (Hellenistic-গ্রিক ভাবধারা) চিন্তাধারা ও ফালসাফা)। ইবনে তাইমিয়্যার পদাঙ্ক অনুসরণের সাহস তাঁরা করেন না। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে তখন যেসব বিষয়ে লিখেছেন সেগুলো নিয়ে এখন লিখতেন না। বরং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উম্মাহ বর্তমানে যেসব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তিনি সেসব বিষয়ে নজর দিতেন। তিনি তাঁর সময়ের চ্যালঞ্জের মোকাবিলায় কলম ধরেছিলেন। অন্যদিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিক সালাফীরা সাত শ বছর আগে ইব্‌ন তায়মিয়্যা যেসব বিষয়ে লিখেছেন সেগুলোর বাইরে নিজেদের নিবদ্ধ করতে ইচ্ছুক নন। উম্মাহ আজ যেসব সমস্যার মুখোমুখী সেগুলোর মোকাবিলায় অগ্রসর নন।

[১৭] তেয়াত্তুর দলের হাদীসের ব্যাপারে আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এবং ব্যাখ্যা করেছি যে, অনেক দল একে ভুল বুঝেছে। এ ধরনের একটি লেকচার পাবেন এখানে: Unity does not Mean Uniformity & The Hadith of the 73 Sects

[এ বিষয়ে শাইখ ইয়াসির ক্বাদীর একটি লেকচার সঞ্চারণ অনুবাদ করেছে। লিঙ্কঃ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও ৭৩ ফিরকার হাদীস (পর্ব-১)]

[১৮] এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বলেছি এখানে: The Birth-Date of the Prophet and the History of the Mawlid

[১৯] কখনো-সখনো এ বিষয়ে এখানে সেখানে দু-একটি খুতবা দেওয়া হলেও, এটা কোনোভাবেই এই সত্যকে হ্রাস করে না যে, যদিও ওসব সমাজে এই ইস্যুগুলো অবাধে চলছে এটি সালাফীদের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় নয়। এই সমালোচনা শুধু সাউদি □আলিমদের জন্য নয়, বরং সব সমাজের জন্য প্রযোজ্য।

[২০] নারীদের অস্তিত্বকেই আপাতদৃষ্টিতে এভাবে মুছে ফেলার এমন বোঝাপড়ার নজির সালাফদের জীবনে নেই। পুরুষ ও নারী সাহাবীরা একে অপরের নাম জানতেন এবং জরুরি প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে কথাও বলতেন। এখানে এটা অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, ইসলামে নারী-পুরুষের পারস্পরিক মেলামেশা হবে যতটা সম্ভব কম এবং বৈধ প্রয়োজনে। আর সেটাও হতে হবে ইসলামি শিষ্টাচার মেনে। কিন্তু আবারো আকিদার বিষয়ের মতই সালাফীরা একটা বিষয়কে এমনভাবে গ্রহণ করে যার হয়ত কিছু বৈধতা রয়েছে এবং পরবর্তীতে এটিকে বিকৃত ও অন্যদিকে ধাবিত করে অতিরঞ্জিত করে তোলে।

[২১] ক্ল্যাসিকাল ও মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ইসলামি রচনায় এই শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু এটা বলা যাবে না যে, এর বেশ চল ছিল। আজকে এই শব্দ দিয়ে যা বোঝানো হয়, তখন ওটা সে অর্থে ব্যবহৃত হতো না।

সূত্রঃ On Salafi Islam

ইয়াসির ক্বাদী

ইয়াসির কাদ্বী একজন পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত আমেরিকান মুসলিম লেখক এবং পশ্চিমা বিশ্বে বহুল পরিচিত স্কলার ও এক্টিভিস্ট। তিনি ইসলামী এবং পশ্চিমা জ্ঞানকে সমন্বয় করার মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানকে আধুনিক বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। তিনি পশ্চিমা বিশ্বে বহুল পরিচিত ইসলামিক শিক্ষামুলক প্রতিষ্ঠান আল-মাগরিব ইন্সটিটিউটের একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিন। পাশাপাশি তিনি আমেরিকার টেক্সাসে মেম্ফিস ইসলামিক সেন্টারের Resident Scholar এবং মেম্ফিস এর রোড্স কলেজের Religious Studies ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট MuslimMatters.org এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।
ইসলাম ও সাম্প্রতিক বিষয়াদির উপর তাঁর প্রচুর লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়। ২০১১ সালে নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদনে ইয়াসির ক্বাদীকে "আমেরিকার ইসলামে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব" হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
শাইখ ইয়াসির ক্বাদী প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি শিক্ষা সমাপ্ত করেন সৌদি আরবে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি করেন আমেরিকার হিউস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে। এরপর চলেন যান মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে আরবিতে ডিপ্লোমা করেন এবং অনার্স করেন হাদীস ও ইসলামিক সাইন্সে। এরপর দাওয়াহ্ কলেজ থেকে ধর্মতত্ত্ব (ইসলামী আকিদা) বিষয়ে মাস্টার্স করেন এবং পুনরায় আমেরিকায় ফিরে যান। সেখানে আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে Religious Studies বিভাগ থেকে পিএইচডি করেন।
তাঁর পিএইচডির বিষয় ছিলো ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর (রাহিমাহুল্লাহ) আকল ও নাকল এর মাঝে সমন্বয়করণের উপর। ড. ইয়াসির ক্বাদীর থিসিসের শিরোনাম ছিলো □Reconciling Reason and Revelation in the Writings of Ibn Taymiyya.□
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মাঝে রয়েছে (১) Riya'a: The Hidden Shirk, (২) Du'aa: The Weapon of the Believer, এবং (৩) An Introduction to the Sciences of the Qur'an।